কসংখ্যা
২০২
২২
১৭৭
৬৭
২০৬
২১৪
৮০
১০৯
১৯৮
১৮৯
৭
৩০
১৯২
১৬৪
৩২
৩৫
২০৮

অবতরণিকা

1.1 প্রাসঙ্গিকী ঃ (ক) শ্রুতি ও স্মৃতি

(খ) ধর্ম ঃ ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র

(গ) ধর্মশাস্ত্রের নামতালিকা

(ক) শ্রুতি ও স্মৃতি ঃ অপৌরুষেয় বেদ নামান্তর 'শ্রুতি'র। 'স্মরণ' অর্থে বা 'মনে করা' অর্থে 'স্মৃ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' যোগে নিষ্পন্ন 'স্মৃতি'। যুগযুগ ধরে পরম্পরাক্রমে শ্রুতিকে স্মরণ করেই আচার্যদের স্মৃত এবং অবিচ্ছিন্নগতিতে আমাদের কাছে আগত বিষয়ই 'স্মৃতি' পদবাচ্য। স্মৃতির অপর নাম **ধর্মশাস্ত্র**। কিন্তু ব্যাপক অর্থে 'স্মৃতি' বলতে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, সূত্রসাহিত্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিজাতীয় অংশ বোঝায়।

(খ) ধর্ম ঃ ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র ঃ 'ধর্ম' শব্দের বিভিন্ন তাৎপর্যবিচারে আমরা বুঝতে পারি যে, ধারণকর্তাই 'ধর্ম'। ঋগ্‌বেদে ধর্ম কোথাও ধারক বা রক্ষক, কোথাও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ব্যবহার বা আচারবিধি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্যই 'ধর্ম' নামে অভিহিত। ছন্দোগ্যোপনিষদে বর্ণাশ্রমের পালনীয় কর্তব্যকে ধর্ম বলা হয় *("ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমীতি")*। এই সব ধর্মের মূল 'বেদ'। *("বেদোঽখিলধর্মমূলম্")*। বস্তুতঃ সমস্ত ধর্মসূত্রের উৎসই হ'ল 'বেদ'।

ধারণকর্তা ধারকই যে ধর্ম তা ব্যাপক অর্থে মহাভারতে বলা হয়েছে। *"ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহু র্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ"*। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে 'ধর্ম' বলতে সমস্ত বর্ণের কর্তব্য বোঝায়। মেধাতিথিভাষ্যে ধর্মের পাঁচ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে—বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, নৈমিত্তিক—ধর্ম এবং গুণধর্ম। স্মৃতিশাস্ত্রে ধর্মের চতুর্বিধ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

"শ্রুতিস্মৃতিসদাচার স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্॥"

ধর্মসংক্রান্তবিষয়ে সূত্রাকারে গ্রথিত অন্যতম বেদাঙ্গগ্রন্থ **ধর্মসূত্র**। আর এই সব সূত্রাকারে গ্রথিত গ্রন্থগুলি যখন শ্লোকাকারে রচিত হয় তখন তাকে বলা হয় **ধর্মশাস্ত্র**। এই ধর্মশাস্ত্রের অপর নামই **স্মৃতি**। *"ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ"*। আর *"মন্বাদিশাস্ত্রং স্মৃতিঃ।"* অমরকোষে বলা হয়েছে—*"স্মৃতিস্তু ধর্মসংহিতা"*। মহর্ষিগণের শ্রুতিস্মরণই 'স্মৃতি' নামে অভিহিত। স্মৃতিগ্রন্থ পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক বিধিবিধানের সংকলন বলেই 'সংহিতা' নামে চিহ্নিত। তাই মনুস্মৃতি মনুসংহিতারই অপর নাম। ক্ষুদ্রতর ধর্মসূত্রের স্তর থেকে বৃহত্তর ধর্মশাস্ত্রের স্তরে উত্তরণ ঘটে কালের বিবর্তনে, সমাজের প্রয়োজনে। তখন সূত্রকারই ধর্মশাস্ত্রকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যেমন গৌতম, বশিষ্ঠ, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, মানব নামের সঙ্গে ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র উভয়েই যুক্ত হতে পেরেছে।

(গ) ধর্মশাস্ত্রের নামতালিকা ঃ বর্তমানে প্রচলিত মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি **মানবধর্মশাস্ত্র** নামেও অভিহিত। এর নাম উল্লেখ করেছেন ধর্মসূত্রকার মহর্ষি গৌতম। মহর্ষি বশিষ্ঠ পাঁচজন ধর্মশাস্ত্রকারের, বৌধায়ন সাতজনের, আপস্তম্ব দশজনের ও মনু পাঁচজন

ধর্মশাস্ত্রকারের নাম উল্লেখ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে কুড়িজন ধর্মশাস্ত্রকারের নাম দেখতে পাওয়া যায়। যাঁদের মধ্যে অনেকে শুধু নামেই রয়েছেন, তাঁদের রচনা দেখতে পাওয়া যায় না। এই কুড়িজন হলেন—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, অশন, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ। আশ্চর্য এই যে, এই নামতালিকায় বৌধায়ন নেই। দার্শনিক কুমারিল ভট্ট আঠারোজন ধর্মশাস্ত্রকারের এবং বৃদ্ধগৌতম সাতান্নজন ধর্মশাস্ত্রকারের নাম উল্লেখ করেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রের পরিশিষ্টের নিবন্ধ গ্রন্থগুলিকে হিসাবে ধরলে ধর্মশাস্ত্রের সংখ্যা একশ' অতিক্রম করে যাবে।

1.2 মনুসংহিতা ঃ ধর্মশাস্ত্র তথা স্মৃতিশাস্ত্র

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্মের মুখ্যশাস্ত্র **মনুসংহিতা** বা **মানবধর্মশাস্ত্র**। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আচার-আচরণ ও রীতিনীতির জটিল আবর্তের মধ্যে সূত্রাকারে গ্রথিত ধর্মসূত্রগুলি যুগের চাহিদা মেটাতে শ্লোকের আদলে রচিত হ'ল ধর্মশাস্ত্ররূপে। মহামুনি মনু তাঁর মহাগ্রন্থ 'মনুসংহিতা'য় অপূর্ব মনীষায় ধর্মের শাশ্বত ও অমূল্য উপদেশ বর্ণনা করেছেন, যা কালজয়ী ও সর্বকালের প্রতিনিধিরূপে আজও অম্লান। ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মভাবনার সাথে সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির অপূর্ব সংমিশ্রণে মনুসংহিতা এক জনপ্রিয় ও অনবদ্য আকরগ্রন্থস্বরূপ। যদিও ধর্মের মূলগ্রন্থ হিসাবে বেদই সর্বজনস্বীকৃত, তথাপি বেদোত্তরকালে বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী ধর্মানুষ্ঠান অত্যন্ত দুরূহ ও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ায় বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বৈদিকগ্রন্থগুলি কার্যতঃ নীরব থাকায়, পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও তন্ত্রাদির আশ্রয় নিতে হয়। তবু উক্ত ধর্মানুষ্ঠানে যোগ্য অধিকারিদের সদাচার ও সংস্কার সম্পর্কে সম্যক্ পরিচয় জ্ঞাপন করে মূলতঃ ধর্মশাস্ত্রই। তাছাড়া প্রাচীনকালের হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি অবশ্যকর্তব্য নিত্যকর্মের প্রকৃত স্বরূপও যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে ধর্মশাস্ত্রে। তবুও বলতে হয়, শ্রুতিস্মৃতি প্রবাহিত ধর্মের পথেই আমাদের জীবনযাত্রার পথ নির্দিষ্ট করা আছে। জীবনযাত্রার পথে শ্রুতি ও স্মৃতির অনুশাসন শিরোধার্য করে সদাচার ও অভীষ্ট হৃদয়বৃত্তিকে গুরুত্ব দিয়ে মানুষ এই নশ্বর জগতেও অমৃতত্ব উপলব্ধি করে। এই ধরনের ধর্মশাস্ত্র সাধারণতঃ **স্মৃতিশাস্ত্র** নামেও পরিচিত। সেজন্য আমরা মনুসংহিতাকে যেমন ধর্মশাস্ত্র বলি, তেমনি স্মৃতিশাস্ত্ররূপেও উল্লেখ করি। যথার্থতঃ মনুসংহিতার অপর নাম **মানবধর্মশাস্ত্র**।

1.3 মনুসংহিতা ঃ বেদোত্তর গ্রন্থরাজির সম্পর্ক

বেদ তো শ্রুতির নামান্তর। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র তথা ধর্মশাস্ত্রর মতো 'মনুসংহিতা' গ্রন্থের সাথে বেদোত্তরযুগের গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, যাজ্ঞবল্ক্যাদি প্রণীত সংহিতার এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র প্রভৃতি কল্পসূত্রে পারিবারিক জীবনের আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমরা প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমধর্মের সম্যক্ পরিচয় পাই। পুরাণ সাহিত্যের মধ্যে দানব্রত প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান ধর্মশাস্ত্রের উপযোগিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। রামায়ণ ও মহাভারত রচনার আগেই ধর্মশাস্ত্রজাতীয় কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

এ কারণে মনুসংহিতায় যে অসংখ্য আখ্যান, উপাখ্যান প্রভৃতির প্রসঙ্গ রয়েছে সেগুলি রামায়ণ, মহাভারতেও উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতের বনপর্ব, শান্তিপর্ব ও অনুশাসন পর্বের বেশ কিছু অংশবিশেষ স্মৃতিশাস্ত্রজাতীয়। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে তো 'মানবাঃ' শব্দের দ্বারা বেশ কয়েকবার মনুসম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। বিদ্যা, ব্যসন, অমাত্য, গুপ্তচর সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রের বিষয়গত সাদৃশ্যের সাথে মনুর অভিমত এক তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ রাখে। বস্তুতঃপক্ষে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ও মানবধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির যে অপূর্ব সংমিশ্রণ তাতে প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

1.4 মনুসংহিতা ঃ উৎকর্ষবিচার

ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক স্থান অধিকার করে আছে। এই মহাগ্রন্থে মহামুনি মনুর যে শাশ্বত উপদেশ তা আজও কালজয়ী। ধর্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে মনুর একচ্ছত্র প্রাধান্য ও অপ্রতিহত কর্তৃত্ব সর্ববাদিসম্মত। স্মৃতির প্রবক্তা মনুর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে ঋগ্বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, অথর্ববেদ প্রভৃতি। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ও তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে মনুর নির্দেশকে 'ভেষজ' বলা হয়েছে। *"মনু বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ ভেষজম্"*—মনু যা কিছু বলেছেন সত্যই তা ভেষজ। অর্থাৎ, ভেষজ ঔষধ যেমন রোগীকে সুস্থ করে তোলে, তেমনি মনুপ্রবর্তিত অনুশাসন ভ্রান্ত পথিকদের সঠিক পথের নিশানা দেয়। আবার, *'সর্বজ্ঞানময়ো বেদঃ সর্ববেদময়ো মনুঃ'*—এই উক্তির মাধ্যমে মনু প্রশংসিত। কারণ, মনুর মধ্যে সমস্ত বেদের জ্ঞান নিহিত। বৈদিক বিধিসমূহের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য বজায় রেখে বেদপ্রতিপাদ্য অর্থ যথাযথ প্রকাশ করায় মনুস্মৃতির প্রাধান্য সূচিত হয় এবং যে স্মৃতিগ্রন্থ মনুর বিরোধী ধারণার বাহক তা প্রশংসার যোগ্য নয়, তার কোনো মূল্য নেই। বৃহস্পতি তৎপ্রণীত স্মৃতিগ্রন্থে তাই বলেছেন—

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতেঃ।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥"

এমন কি, মনুপ্রচারিত ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষের উপদেশ যে অন্যান্য গ্রন্থাদিকে টক্কর দিতে পারে তার ইঙ্গিত মেলে—

"তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
ধর্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে॥"

এই উক্তির মধ্যে মনুসংহিতার দুই খ্যাতনামা ভাষ্যকার মেধাতিথি ও কুল্লূকভট্ট শ্রুতি ও অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করে এভাবেই মনুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে অগ্রসর হয়েছেন। বর্তমানে প্রচলিত মনুস্মৃতিই মানবধর্মশাস্ত্র একথা তাঁরা উভয়েই প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁদের মতে মানবধর্মশাস্ত্রের মূল উদ্গাতা হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। কিন্তু আমরা প্রথমে মনুর মুখনিঃসৃত স্মৃতিবচন শুনতে পাই বলেই মনুকে মানবধর্মশাস্ত্রের রচয়িতা বলা হয়। নারদের বচন থেকে জানা যায় যে, শতসহস্রশ্লোকযুক্ত মনুস্মৃতি তো প্রজাপতি ব্রহ্মার রচনা, পরবর্তীকালে আচার্য মনু প্রমুখ ধর্মশাস্ত্রকারগণ তার সংক্ষেপীকরণ করেন। আচার্য মনু সম্পর্কে এসব সপ্রশংস উক্তি কিংবা মনুসংহিতার মাহাত্ম্য সম্পর্কে এসব সশ্রদ্ধ বচন অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। শঙ্করাচার্য,

কুমারিলভট্ট এবং শবরস্বামীর মতো প্রখ্যাত চিন্তাবিদগণ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রে মনুর প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। ভৃগুদ্বারা কথিত হলেও মনুসংহিতার মূল স্রোত যে মনু থেকেই আগত তার ঘোষণা উচ্চকিত। বৈদিক ভাবরাশিকে বৃহত্তর সমাজে প্রচারিত করার উদ্দেশ্যেই মনু তাঁর সংহিতায় উপদেশ দিয়েছেন। মহাভারতে তো অসংখ্যবার মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে মনু কখনও **স্বায়ংভুব**, কখনও **প্রাচেতস** নামে বিশেষিত। আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিবস্বৎপুত্র **বৈবস্বত মনুর** নাম উল্লিখিত। নারদ, বৃহস্পতি, গৌতম, বশিষ্ঠ প্রমুখ ধর্মশাস্ত্রকারগণ স্পষ্টতঃই মনুর ঋণ অকপটে স্বীকার করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রাচীন টীকাকার বিশ্বরূপ তাঁর গ্রন্থে এমন উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেগুলোর সাথে মনুসংহিতার শ্লোকের যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। মনুস্মৃতির প্রাধান্য প্রতিপাদনে মহাভারতে এমন মন্তব্য দেখা যায় যে, বেদ, পুরাণ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মতো মনুস্মৃতির বচনগুলিকেও যুক্তিতর্কের গণ্ডির বাইরে থেকেই সরাসরি মান্যতা দেখানো উচিত। মহাকবি কালিদাস মনুনির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন—*"আ মনোর্বর্ত্মনঃ ক্ষুণ্ণম্"*। 'আমরা যেন আমাদের পিতৃপুরুষ মানবজাতির পিতা মনু নির্দিষ্ট পথ থেকে দূরে সরে না যাই' একথাও তো বৈদিকযুগে ঋষিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। পুত্রকন্যার দায়াধিকার সম্বন্ধে নিরুক্তকার যাস্ক উদ্ধৃত করেছেন স্বায়ম্ভুব মনুর বচন। এই সব কারণে একদিকে যেমন মহামুনি মনুর প্রাচীন গৌরবের কথা আমাদের বারংবার মনে পড়ে যায়, তেমনি অন্যদিকে ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে মনুসংহিতার অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রচারিত হয়।

1.5 মনুসংহিতা ঃ রচনার বিবর্তন

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র মানবধর্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতাই প্রধানতম ও প্রাচীনতম। আদিতে মূলগ্রন্থ বিস্তৃতভাবে বিরচিত হলেও কালের বিবর্তনে এটি সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হয়ে সংকলিত হয়েছে। মনুসংহিতা রচনার এই বিবর্তনের ইতিহাস বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়।

নারদস্মৃতিতে উল্লেখ আছে যে, মানবধর্মশাস্ত্রে প্রথমে একলক্ষ শ্লোক ও ১৮০টি অধ্যায় ছিল। সেই ধর্মশাস্ত্রকে নারদ সংক্ষিপ্ত করেন বারো হাজার শ্লোকে এবং তারপর ঋষি মার্কণ্ডেয় তাকে আট হাজার শ্লোকে সংকলিত করেন। সর্বশেষ ভৃগুপুত্র সুমতি তাকে চার হাজারে নামিয়ে আনেন।

মহাভারতে মনুসংহিতা রচনার বিবর্তনের ইতিহাসটি অন্য ধরনের। প্রথমে অন্যান্য দেবতাদের সাথে মিলিত হয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা এক লক্ষ অধ্যায়ে ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন ('দণ্ডনীতি')। তারপর ভগবান্ শঙ্কর (শিব) দশ হাজার অধ্যায়ে ('বৈশালাক্ষ' বা 'তন্ত্র'), তারপর ইন্দ্র পাঁচ হাজার অধ্যায়ে ('বাহুদণ্ডক'), তারপর বৃহস্পতি তিন হাজার অধ্যায়ে ('বার্হস্পত্যনীতি') এবং সবশেষে শুক্রাচার্য বা ভার্গব এই গ্রন্থকে এক হাজার অধ্যায়ে ('শুক্রনীতি' বা 'ঔশনস') সংকলিত করেন।

পুরাণে এই ধর্মশাস্ত্রের অন্যরকম বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। সর্বপ্রথম এক বৃহৎ ধর্মশাস্ত্রের রচনা স্বয়ং মনুর। তারপর তাকে ক্রমে ক্রমে সংক্ষিপ্ত করলেন—ভৃগু, নারদ, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরা।

কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ঐতিহ্যাগত মনুসংহিতার মোট শ্লোকসংখ্যা ২৬৯৪টি এবং অধ্যায় মাত্র বারোটি। এই রূপটি কোন্ সময় কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা পূর্বকথিত বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করেও নির্ণয় করা যায় না।

1.6 মনুসংহিতা ঃ রচনাকাল

জনশ্রুতি এই যে, মানবধর্মশাস্ত্র তথা মনুসংহিতার মূল উপজীব্য হ'ল কৃষ্ণযজুর্বেদীয় "মানবধর্মসূত্র"। তবু, এর অনুকূলে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই, সুতরাং বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করে মনুসংহিতার সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার। বর্তমানে প্রচলিত মনুসংহিতা আদিতে সেরকম ছিলই না। কালের বিবর্তনে অনেক স্তর অন্ততঃ তিনটে স্তরের মধ্য দিয়ে মনুসংহিতা বর্তমানের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যক ও ৫৯ সংখ্যক শ্লোকের বক্তব্য অনুযায়ী এক লক্ষ শ্লোকযুক্ত মানবধর্মশাস্ত্র তথা মনুস্মৃতির উদ্গাতা প্রজাপতি ব্রহ্মা। কিন্তু মনুর মুখনিঃসৃত স্মৃতিবচন মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ রপ্ত করলেও মনুব্যাখ্যাত এই ধর্মশাস্ত্রের প্রচারের ভার অর্পিত হয়েছিল ভৃগুর উপর। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগেই আমাদের দেশে এই ধর্মশাস্ত্রের যে প্রচার ছিল তেমন কিছু কিছু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সবের ভিত্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মনীষিগণ মনুসংহিতার রচনাকাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন, যদিও অদ্যাবধি অনেক সমস্যার সমাধান হয় নি ও অনেক বিষয় এখনও বিতর্কিত।

মনুসংহিতার টীকাগ্রন্থগুলির মধ্যে মেধাতিথিভাষ্য প্রাচীনতম। এটি নবম খ্রীস্টাব্দের রচনা। মেধাতিথি তাঁর ভাষ্যে পূর্ববর্তী ভাষ্যকারদের 'পূর্ব' এবং 'চিরন্তন' শব্দের সাহায্যে অভিহিত করে তাঁদের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা মনুসংহিতা রচনার কয়েক শতাব্দী আগে বিদ্যমান ছিলেন। মেধাতিথির অন্ততঃ তিন/চারশ' বছর আগে যদি পূর্বসূরিদের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষ্য রচিত হয়ে থাকে তাহলে তার অনেক আগেই খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দের মধ্যে (200B.C—200A.D) মনুসংহিতার রচনাকাল ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। প্রাচ্যপণ্ডিত পি. ভি. কাণে এই মতই পোষণ করেন।

প্রখ্যাত দার্শনিক শঙ্করাচার্য (৬৮৬-৭২০ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর বেদান্ত আলোচনায় প্রায়ই মনুসংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দার্শনিক কুমারিলভট্ট (৬৫০ খ্রীস্টাব্দ) মনুসংহিতাকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। পূর্বমীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকার শবরস্বামী (৫০০ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর ভাষ্যে মনুসংহিতা থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। মহাকবি ভারবির (৬০০ খ্রীস্টাব্দ) কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যে বনেচরের উক্তিতে আচার্য মনুর প্রসঙ্গ উল্লিখিত—*কৃতারিষড়্বর্গজয়েন* ***মানবী***। মহাকবি ভাসের (২০০ খ্রীস্টাব্দে) প্রতিমা নাটকে 'মানবীয় ধর্মশাস্ত্রে'র নামোল্লেখ ইত্যাদি থেকে সহজেই অনুমেয় যে, মনুসংহিতা অন্ততঃ দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের আগেই বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার (তৃতীয় খ্রীস্টাব্দ) চেয়ে মনুসংহিতা প্রাচীনতর। কারণ, প্রজ্ঞান, পরীক্ষা, ব্যবহার, সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার প্রভৃতি যা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আলোচিত, তা কিন্তু মনুসংহিতায় অনুপস্থিত। সুতরাং তৃতীয় শতাব্দীর আগেই কোনো সময়ে মনুসংহিতা অবশ্যই রচিত ও সংকলিত হয়েছিল।

বৃহস্পতিস্মৃতিতে মনুসংহিতার নিয়োগপ্রথা প্রভৃতি বিতর্কিত ও পরস্পরবিরোধী বিষয়ের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে মনুকে প্রথম ধর্মশাস্ত্রকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিস্মৃতির সমকালীন কাত্যায়নস্মৃতিতে মনুস্মৃতির অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, অনেক বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে। ভাষ্যকার কুলুকভট্টও এটি সমর্থন করেছেন। সুতরাং ৬০০ খ্রীস্টাব্দের কয়েক শতাব্দী আগে অর্থাৎ দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দ কিংবা তার আগে মনুসংহিতার রচনাকাল মনে করা যেতে পারে।

মনুসংহিতার রচনাকাল নির্ণয়ে মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের একটি শ্লোক প্রমাণরূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ বশাঃ॥
মুখবাহূরুপন্নানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।"

এখানে উল্লিখিত জাতিগুলির মধ্যে **'যবন'** ও **'কাম্বোজ'** সম্রাট অশোকের পঞ্চম শিলালেখে উল্লিখিত রয়েছে। এ থেকে মনে হয় যে, মনুসংহিতার কোনো কোনো অংশ খ্রীঃপূঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতকে (300—400 B.C.) রচিত হয়েছিল।

আর শক, যবন, পারদ, পহ্লব, চীন, দরদ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদের কথা উল্লিখিত দেখে মনে হয় যে, মনুসংহিতা প্রথম খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ব্যূহলার এই মত পোষণ করেন। তবে কিছুকাল যাবৎ বর্তমানে প্রচলিত মনুসংহিতার সঙ্গে নানাবিষয়ের সংযোজন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। মূল মনুসংহিতার রচনাকাল দুনির্ণেয় হলেও একথা সত্য যে, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে মনুসংহিতার রচনাকাল অক্লেশে সীমাবদ্ধ রাখা চলে।

1.7 মনুসংহিতা ঃ প্রভাব—ভারতে ও বহির্ভারতে

মনুসংহিতার কালজয়ী প্রভাব ভারতের সীমা ছাড়িয়ে বহির্ভারতের সাহিত্যে বিস্তার লাভ করেছে। ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের অনুশাসনপর্বে স্পষ্টতই মনুপ্রণীত সংহিতা বা ধর্মশাস্ত্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে— *"মনুনাভিহিতং শাস্ত্রং যচ্চাপি কুরুনন্দন।*
তত্রাপ্যেষ মহারাজ দৃষ্টো ধর্মঃ সনাতনঃ॥"

মনুসংহিতায় 'ইতিহাস' শব্দের উল্লেখ মহাভারতকে লক্ষ্য করেই কিনা তা বিতর্কিত, তবুও মনুসংহিতায় উল্লিখিত অসংখ্য আখ্যান উপাখ্যানের প্রসঙ্গ মহাভারতেও এসে পড়েছে। অঙ্গিরা, নহুষ, পৈজবন, বেণ ও দুষ্যন্ত প্রমুখর ইতিহাসও বর্ণিত। আদিপর্বে এক উপাখ্যানে দেখা যায় যে, দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ববিধিমতে বিবাহে রাজী করানোর জন্যে স্বায়ংভূব মনু কথিত অষ্ট 'বিবাহবিধির' কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বনপর্ব, শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্বের মতো কিছু স্মৃতিশাস্ত্রজাতীয় পর্ব মনুসংহিতার প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারে না। মহাভারতে মনুসংহিতার মোট তেত্রিশটি শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়—সেগুলির মধ্যে সতেরোটি বর্তমানে প্রচলিত মনুসংহিতায় পাওয়া যায়। পাঁচটি শ্লোক মৌখিক উদ্ধৃতি ও এগারোটি শ্লোক নীতিগতভাবে সাদৃশ্যযুক্ত।

বাল্মীকিরচিত রামায়ণে মনুর শ্লোকরূপে অতি প্রচলিত কয়েকটি শ্লোকের নিদর্শন রামায়ণ মহাকাব্যে মনুসংহিতার প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়।

রাজতন্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে মনুসংহিতার বিষয়গত সাদৃশ্য দেখা যায় এবং 'মানবাঃ' শব্দের দ্বারা কৌটিল্য বেশ কয়েকবার মনুসম্প্রদায়ের কথা বলতে চেয়েছেন।

বহির্ভারতে বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে মনুসংহিতার গভীর ও ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ব্রহ্মদেশে (বর্তমানে মায়ানমার) কিছু আইনের গ্রন্থে মনুর ঋণ স্পষ্টতই স্বীকৃত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় মনুর অনুসরণে রচিত প্রাচীনতম আইনগ্রন্থের নাম *Kutara Manawa.* থাইল্যান্ডের অনুরূপ একটি আইনগ্রন্থ *Phra Dharmasastra.* ফিলিপাইনে মনুসংহিতার প্রভাবের প্রমাণ ঐ দেশের সেনেট চেম্বারের আর্ট গ্যালারীতে রক্ষিত মনুর মূর্তি। কাম্বোডিয়া বা কাম্পুচিয়ার একটি শিলালেখে মনুস্মৃতির একটি শ্লোক বিদ্যমান। সিংহলের 'চুলবংশ' নামক গ্রন্থে মনুকথিত রাজধর্ম, চীনদেশে প্রাপ্ত এক পুঁথিতে মনুর আইনকানুন, জাপানীভাষায় মনুস্মৃতির অনুবাদ, মনুস্মৃতির প্রেরণায় জার্মান দার্শনিক নিৎসের বিখ্যাত *Philosophy of Superman* গ্রন্থরচনা, পারস্যের দেবগোষ্ঠীর অন্যতম স্বীকৃত দেবতা মনু ও সেখানকার সাম্রাজ্য পরিচালনায় রাজা দরায়ুসের আমলে মনুস্মৃতির অনুসরণে আইনপ্রণয়ন প্রভৃতি দেশকালনির্বিশেষে মনুসংহিতার সর্বাতিশায়ী প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়।

1.8 মনুসংহিতা ঃ রচয়িতা

বর্তমান প্রচলিত মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি বা মানবধর্মশাস্ত্র নামে যে বিশাল ধর্মগ্রন্থটি পাওয়া যায়, তার রচয়িতা স্বাভাবিকভাবে মনু বলে ভাবা গেলেও তিনি স্বয়ং মনু কিনা সে বিষয়ে তর্কের অন্ত নেই। তবে এ মহাগ্রন্থ যে সাক্ষাৎ মনুপ্রণীত নয় তা কিন্তু এই গ্রন্থ মধ্যেই (প্রথম অধ্যায়, ৫৮নং শ্লোকে) স্বয়ং মনুই অকপটে স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন—

"ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদ্ গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্॥"

—এই ধর্মশাস্ত্রের রচয়িতা প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে মনুকেই যথাবিধি শিখিয়েছিলেন। তারপরে পরেই মরীচিপ্রমুখ ঋষিদের এই শাস্ত্র শেখালেন মনুই। এর পরবর্তী শ্লোকে (১/৫৯) মনু যখন বলেন, তাঁর পুত্রোপম যোগ্য শিষ্য মহর্ষি ভৃগু এই মহাশাস্ত্র আদ্যোপান্ত সবটাই শোনাবেন *("এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ")* এবং মহর্ষি ভৃগু আবার মনুব্যাখ্যাত সেই শাস্ত্র "আপনারা শ্রবণ করুন" এরূপ আবেদন জানিয়ে অন্যান্য ঋষিদের নিকট বর্ণাশ্রমধর্ম আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয় শুনিয়ে গ্রন্থসমাপ্তিকালে যখন *"ইত্যেতন্মানবং শাস্ত্রং ভৃগুপ্রোক্তং পঠন্ দ্বিজঃ"* একথা ঘোষণা করেন তখন এটাই প্রমাণিত হয় যে, ঐতিহ্য অনুসারে আগত বর্তমান প্রচলিত মনুসংহিতা সাক্ষাৎ মনুপ্রোক্ত না হলেও আচার্য মনুর আদেশেই মহর্ষি ভৃগু কথকতার কাজ সম্পন্ন করেছেন। মনুসংহিতার অন্যতম টীকাকার গোবিন্দরাজ বলেন, 'ভৃগু' প্রথমপুরুষে কথিত হওয়ায় হয়ত কোনও ভৃগুশিষ্য মনুসংহিতা ব্যাখ্যা করেছেন। মহর্ষি ভৃগুর নিজের কোনো রচনা

বলে এটিকে তিনি মেনে নিতে চান নি। অবশ্য এই মহাগ্রন্থ আদিতে যে মনুবিরচিত সে বিষয়ে তিনি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ। কারণ, নারদস্মৃতিতে বলা আছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা একলক্ষ শ্লোকে মানবধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, পরে মনু প্রমুখ ধর্মশাস্ত্রকারগণ ক্রমশঃ তা' সংক্ষিপ্ত করেন।—*"শতসাহস্রো গ্রন্থঃ প্রজাপতিনা কৃতঃ, স মন্বাদিভিঃ ক্রমেণ সংক্ষিপ্তঃ"*। ভবিষ্যপুরাণের মতে—স্বায়ম্ভুবশাস্ত্র বা মনুস্মৃতির চারটি রূপান্তর ছিল। এই রূপান্তরসাধনের কারিগর ছিলেন যথাক্রমে ভৃগু, নারদ, বৃহস্পতি এবং আঙ্গিরস। *"ভাগবীয়া নারদীয়া চ বার্হস্পত্যাঙ্গিরস্যাস্যাপি।"* তবে বর্তমান প্রচলিত মনুসংহিতার রচয়িতা মনু নন, ভৃগুও নন, অন্য কোনও একজন অজ্ঞাত তৃতীয়ব্যক্তি—একথা প্রাচ্যপণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। এর পেছনে তাঁদের যুক্তি এই যে, আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থকারগণ প্রথমপুরুষেই নিজেদের নাম উল্লেখ করতেন, সরাসরি উত্তমপুরুষে নামোল্লেখ তাঁদের ছিল নাপসন্দ। এই যুক্তি সমর্থন করেন মনুসংহিতারই অন্যতম প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার কুল্লুকভট্ট। সুতরাং নানা মতভেদের মধ্যে অধিকাংশ চিন্তাবিদ্‌দের অভিমত হ'ল—বর্তমান মনুসংহিতার রচয়িতা মহর্ষি ভৃগু বা কোনো ভৃগুশিষ্য।

1.9 মনুসংহিতা ঃ মনুর পরিচয়

মূল মানবধর্মশাস্ত্রের রচয়িতা 'মনু' কে ছিলেন? মনু ছিলেন সর্বজ্ঞানময়। তিনি নিঃসন্দেহে মনুসংহিতার মূল প্রবক্তা। ঋগ্বেদের যুগ থেকে মনু নানাভাবে বর্ণিত। কখনও তিনি 'আদি পিতা' *(প্রজানাং পিতৃভূতঃ মনুঃ)*, কখনও প্রভাবশালী, শাস্ত্রপারঙ্গম সদাচারী স্বতন্ত্র মানুষ, কখনও তিনি অগ্রগণ্য ধর্মশাস্ত্রকার, কখনও বা মনু সাক্ষাৎ পরমেশ্বরসম। নানা নামেও মনু উল্লেখিত। কখনও সাবর্ণি, কখনও স্বায়ম্ভুব, কখনও প্রাচেতস, কখনও বা ঐতিহ্যময় বৈবস্বত নামে বিশেষিত। ঐতিহ্য পরম্পরাগতভাবে মনুর নাম সুবিদিত।

মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের কণ্ঠে মনুসম্পর্কিত একই অভিমতের প্রতিধ্বনি।

মেধাতিথি বলেন, *'মনুর্নাম কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ অনেকবেদশাখাধ্যয়নবিজ্ঞানানুষ্ঠানসম্পন্ন-স্মৃতিপরম্পরাপ্রসিদ্ধঃ'*—অর্থাৎ, মনু নামে ছিলেন একজন পুরুষ যিনি বহু বেদশাখা অধ্যয়ন করে জ্ঞানীব্যক্তি হিসাবে সংশ্লিষ্ট বৈদিককর্মানুষ্ঠানে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

গোবিন্দরাজ মনু সম্পর্কে বলেছেন, *"মনুর্নাম মহর্ষিরশেষবেদার্থজ্ঞানেন প্রাপ্তমনুসংজ্ঞঃ আগমপরম্পরাসকলবিদ্বজ্জনকর্ণগোচরীভূতঃ সর্গস্থিতিপ্রলয়কারণে অধিকৃতঃ।"* অর্থাৎ, মনু নামে ছিলেন এক ঋষি, তাঁর সকল বেদার্থের জ্ঞান থাকায় তিনি ছিলেন সার্থকনামা। আগমপরম্পরাক্রমে যাঁর নাম শুনেছেন সমস্ত বিদ্বজ্জনই, যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সাধনে ছিলেন সক্ষম। গোবিন্দরাজের এই উক্তি যেন মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩৩ এবং ৩৪ সংখ্যক শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি।

মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজ আচার্য মনুকে মুখ্যতঃ এক শাস্ত্রজ্ঞ আচারবান্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার ঃ মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে সাক্ষাৎ মনুর জবানীতে জানা যায় যে, তিনি নিজেকে ব্রহ্মার পুত্র সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি বলেছেন ও দ্বাদশ অধ্যায়ে ভৃগুর জবানীতে মনুকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপে অভিহিত করা হয়েছে—

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।।"

এইসব আলোচনা থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন আচার্যদের মধ্যেও মনুর পরিচয় বিতর্কিত ছিল। তৎসত্ত্বেও প্রকটিত সত্য এই যে, আচার্য মনু ছিলেন এক বিশেষ ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধর্মসূত্রকার। বশিষ্ঠ, সাংখ্যায়ন, গৌতম ও বৌধায়ন প্রমুখ ধর্মসূত্রকারের উক্তিগুলিই এর প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে আবার জটিলতাবৃদ্ধি করতে বৃদ্ধমনু ও বৃহন্মনুর আবির্ভাব ঘটে। শিষ্যসম্প্রদায়ে এই দু'জনের নামেও দু'একখানি ধর্মসংহিতার প্রচলন ছিল। যদিও এ গ্রন্থগুলি অধুনা লুপ্ত। ফলে যাবতীয় সংশয়, নানা প্রশ্ন। প্রশ্নগুলির উত্তর ও এই দু'জনের পরিচয় কোনভাবেই পাওয়া যাবে না। এই প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আলোচ্যমান মনু মানুষ, দেবতা বা অবতার ছিলেন কিনা তার সপক্ষে কোনো অকাট্য প্রমাণ না থাকায় একথা সর্ববাদিসম্মত—শীর্ষস্থানীয় ধর্মশাস্ত্রকার হিসাবে মনুর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত—সে আসন থেকে তাঁকে টলানোর শক্তি এখনও কারোর নেই।

1.10 মনুসংহিতা ঃ টীকাকারগণ

মনুসংহিতার যে কয়খানি ভাষ্য বা টীকা বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত রয়েছে তন্মধ্যে মেধতিথি, গোবিন্দরাজ ও কুল্লুকভট্টের ভাষ্য বা টীকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) মেধাতিথি ঃ ভট্ট মেধাতিথির আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ ৮২৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৯০০ খ্রীস্টাব্দ। মেধাতিথিরচিত **"মনুভাষ্য"** প্রাচীনতম এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৃহত্তম টীকাগ্রন্থ। এর বহু অংশ হারিয়ে গেলেও এখনও মেধাতিথির মনুভাষ্যই সর্বোত্তম তথ্যানুগ ভাষ্যগ্রন্থ হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত।

(২) গোবিন্দরাজ ঃ খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকের টীকাকার গোবিন্দরাজের **"মনুটীকা"** মনুস্মৃতির উপর রচিত এক বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ। এটি দুর্বোধ্য নয়, কিন্তু এতই সংক্ষিপ্ত যে, একে মেধাতিথিভাষ্যের সংক্ষিপ্তসার বলা যেতে পারে। অনেক সময় গোবিন্দরাজ পূর্বসূরিদের বিকল্প ব্যাখ্যা বর্জন ক'রে নিজস্ব অভিমত উপস্থাপনে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছেন।

(৩) কুল্লুকভট্ট ঃ বাঙ্গালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নন্দনএলাকা নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর কুল্লুকভট্ট (খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক) রচিত মনুস্মৃতিভাষ্য **"মন্বর্থমুক্তাবলী"** অতিপ্রচলিত এক নির্ভরযোগ্য টীকাগ্রন্থ। এটি একদিকে গোবিন্দরাজের 'মনুটীকা'র উন্নত রূপান্তর এবং অন্যদিকে মেধাতিথির 'মনুভাষ্যের'র সংক্ষিপ্ত রূপান্তর। অদ্যাবধি 'মন্বর্থমুক্তাবলী'র মতো সহজ সরল সংক্ষিপ্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ প্রয়োজনীয় জনপ্রিয় মনুস্মৃতিভিত্তিক টীকাগ্রন্থ আর একখানিও রচিত হয় নি।

এছাড়া আরও সে সব মনুর টীকাকারগণের নামোল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন—সর্বজ্ঞনারায়ণ, রাঘবানন্দ ও নন্দন।

(৪) সর্বজ্ঞনারায়ণ ঃ সর্বজ্ঞনারায়ণ (সংক্ষেপে নারায়ণ, উপাধি-সর্বজ্ঞ) রচিত মনুসংহিতার একটি বিখ্যাত টীকাগ্রন্থ **'মন্বর্থবিবৃতি'** বা **'মন্বর্থনিবন্ধ'** (১১০০-১৩০০ খ্রীস্টাব্দ)। এই গ্রন্থে রয়েছে মনুস্মৃতির কিছু নির্বাচিত দুরূহ অংশের আলোচনা। টীকাকার তাঁর পূর্বসূরিদের টীকাভাষ্যকে 'কু' আখ্যা দিয়ে নিজের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যার তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

(৫) রাঘবানন্দ ঃ রাঘবানন্দ সরস্বতীর (১৬০০-১৭০০ খ্রীঃ অঃ) মনুস্মৃতিভিত্তিক ভাষ্যগ্রন্থ **'মন্বর্থচন্দ্রিকা'**, মূলতঃ কুল্লুকভট্ট মতানুসারী হলেও রাঘবানন্দ তাঁর টীকায় মনুস্মৃতির দুরূহ ও জটিল অংশের ব্যাখ্যায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন।

(৬) নন্দন বা নন্দনাচার্য ঃ দক্ষিণভারতীয় পণ্ডিত নন্দন বা নন্দনচার্য রচিত মনুস্মৃতিভিত্তিক সংক্ষিপ্ত টীকাগ্রন্থ **'মনুব্যাখ্যান'** বা **'নন্দিনী'**। নন্দন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞনারায়ণের সমর্থক হলেও কোথাও কোথাও তিনি মেধাতিথি, কুল্লুকভট্ট, গোবিন্দরাজকে সমর্থন করেছেন।

1.11 মনুসংহিতা ঃ একনজরে বিষয়বস্তু

মানবধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা ভারতীয় জীবনের সর্বত্রই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক আদর্শ, আচার-আচরণ, ব্যবহার—কার সঙ্গে যোগ নেই মনুসংহিতার?

সুললিত অনুষ্টুপ্ ছন্দে, ২৬৯৪টি শ্লোকে রচিত ও বারোটি অধ্যায়ে বিধৃত এই মহাগ্রন্থ মনুসংহিতায় সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে বিবিধ বিষয় সম্যক্ আলোচিত।

অধ্যায়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ প্রথম অধ্যায় ঃ সৃষ্টিতত্ত্ব। **দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ** সংস্কারাদি উপনয়ন ও ব্রহ্মচারীর কর্তব্য। **তৃতীয় অধ্যায় ঃ** বৈবাহিক সংস্কার, গার্হস্থ্যধর্ম, দাম্পত্যজীবনচর্চা, নারীর স্থান, পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও শ্রাদ্ধবিধি। **চতুর্থ অধ্যায় ঃ** জীবন-জীবিকা, গার্হস্থ্যবিধি, স্নাতকের আচার-আচরণ। **পঞ্চম অধ্যায় ঃ** ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার, অশৌচশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি, সধবা-বিধবার ধর্ম। **ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ** বানপ্রস্থে বিহিত কর্ম, মোক্ষের উপায়, সন্ন্যাসধর্ম। **সপ্তম অধ্যায় ঃ** রাজধর্ম। **অষ্টম অধ্যায় ঃ** বিচারব্যবস্থা। **নবম অধ্যায় ঃ** স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম, দায়ভাগ, দ্যূতক্রীড়া, চৌরাপসারণ, বৈশ্যশূদ্রের কর্তব্যকর্ম। **দশম অধ্যায় ঃ** সংকরবর্ণের উৎপত্তি, বর্ণসমূহের আপৎকালীন ধর্ম। **একাদশ অধ্যায় ঃ** প্রায়শ্চিত্তবিধি। **দ্বাদশ অধ্যায় ঃ** উত্তম-মধ্যম-অধমভেদে ত্রিবিধ দেহান্তর প্রাপ্তি, মোক্ষধর্ম, কার্যাবলীর গুণদোষ পরীক্ষা, প্রচলিত দেশধর্ম, জাতিধর্ম, কুলধর্ম, বেদবিরোধী পাষণ্ডধর্ম ও বণিক প্রভৃতি সংঘের গণধর্ম।

1.12 মনুসংহিতা ঃ সপ্তম-অধ্যায়স্থ রাজধর্ম

মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজধর্মবিষয়ক আলোচনা রয়েছে। রাজার ধর্ম = রাজধর্ম। রাজধর্মে 'রাজ' শব্দ ক্ষত্রিয়জাতিবাচক নয়, এখানে সাধারণ অর্থে অর্থাৎ রাজ্যাভিষেক এবং রাজ্যে প্রজাদের উপর আধিপত্য, প্রজারক্ষণ ও প্রজাপালন প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট, রাজ্যশাসক যে কোন ব্যক্তিবিশেষকে বোঝায়। এতাদৃশ রাজার অনুষ্ঠেয় কর্ম যা কেবল দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল উৎপাদক নয়, রাজার কর্তব্যকর্ম, রাজার আবির্ভাব, রাজার সাফল্য বা সিদ্ধিলাভ—সমস্ত কিছু রাজধর্মের অন্তর্ভুক্ত। কান টানলে যেমন মাথা এসে যায়, রাজা বললেই রাজ্যপ্রসঙ্গ এসে পড়ে। *"প্রভৈশ্বর্যং হি রাজ্যমুচ্যতে"*। রাজ্য ও রাজা—সমধাতুজশব্দ। রাঙানো, খুশি করা, শোভা পাওয়া ইত্যাদি অর্থবাচক 'রঞ্জ্' ধাতু থেকে রাজা ও রাজ্যের উৎপত্তি। প্রজাদের রঞ্জন বা খুশি করার জন্যই রাজা সার্থকনামা। 'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ' একথা মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন। এতাদৃশ রাজার উৎপত্তি, কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের

আলোচ্য। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে, কামন্দকীয় নীতিসারে, শুক্রনীতিতে রাজধর্ম, রাজকর্তব্য ও রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে।

কেবলমাত্র বাসস্থান বা জনপদ বললেই রাজ্য বোঝায় না। রাজ্য শব্দের ব্যাপক ও বিশেষ অর্থ রয়েছে। আচার্য মনু প্রমুখর মতে রাষ্ট্র বা রাজ্য সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট। কয়েকটি অঙ্গবিশিষ্ট মনুষ্যশরীরবৎ সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট রাষ্ট্র। শুক্রাচার্য বলেছেন যে, এই সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের মস্তক হলেন রাজা, চক্ষু মন্ত্রিগণ, কর্ণ মিত্রবর্গ, মুখ রাজদূত বা রাজকোশ, মন হ'ল দণ্ড বা সৈন্যবল, হস্ত দুর্গ এবং পদ হ'ল জনপদ। কেউ কেউ অঙ্গকে প্রকৃতিও বলেন। তাই সপ্তপ্রকৃতিবিশিষ্ট রাষ্ট্র হ'ল—স্বামী (রাজা), অমাত্য (মন্ত্রী), জনপদ (প্রজাপুঞ্জ), দুর্গ (সংরক্ষিত নগর বা রাজধানী), কোশ (অর্থভাণ্ডার ও অর্থসঞ্চয়), দণ্ড (রাষ্ট্রশাসনের উপায় বা শক্তি) এবং মিত্র (নিজের বশীভূত পররাষ্ট্র)।

প্রাচীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজতন্ত্র। 'রাজাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হ'ত রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা। অরাজক রাষ্ট্রের সুস্থিতির লক্ষ্যে ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পালের অংশসম্ভূত দৈবীশক্তির আধার অসীম শক্তিধর দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী মনুষ্যরূপী রাজার আবির্ভাব। মন্ত্রী, অমাত্য, সচিব ও দূতবর্গের পরামর্শে ও সহযোগিতায় বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষক রাষ্ট্রের কর্ণধার এক বেসামাল রাষ্ট্রকে সুনিয়ন্ত্রিত করে উন্নয়নের মাধ্যমে একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। মনুর আমলে প্রাচীন ভারতের রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সহায়ক শক্তির পরোক্ষ প্রভাবই রাজতন্ত্রের মধ্যে গণতন্ত্রের বীজ বপন করেছিল। অধুনা ভারতে জরুরী কারণে রাষ্ট্রপতি-শাসনব্যবস্থা সাময়িক হলেও তা সেকালের রাজতন্ত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সামদানভেদদণ্ড এই চারিটি উপায় ও সন্ধিবিগ্রহযানাসনদ্বৈধীভাবসমাশ্রয় এই ষাড়্‌গুণ্যলক্ষণ ছয়টি গুণ রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উপায় ও কৌশলের দিক সূচিত করে। উদার করনীতি বিজ্ঞানসম্মত ও বিবেচনাপ্রসূত ছিল। যুদ্ধ ও সন্ধি আয়ত্তে থাকায় রাজপ্রতিনিধিরূপে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে রাজদূত সচেতন থাকতেন। রাষ্ট্র যুদ্ধনীতি ছিল মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত। সাম দান ভেদ প্রভৃতি তিনটি উপায় ব্যর্থ হলে তখনই কেবলমাত্র যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। কৌশল যাই হোক না কেন অন্যায় যুদ্ধ বরদাস্ত করা হ'ত না। 'মারি অরি ছলে বলে কি কৌশলে' হ'ত না।

রাজ্য তথা রাজধানীর নিরাপত্তা বিধানে দুর্গনির্মাণ ও সুরক্ষাব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র রাখা হ'ত। আত্মরক্ষায়ও সংযত আচরণে জিতেন্দ্রিয় রাজা সদাসচেষ্ট ও সদাতৎপর থাকতেন।

গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা খুবই সুচিন্তিত এবং যুক্তিপূর্ণ ছিল যা অধুনা বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রতিটি গ্রাম ছিল এক একটি রাজনৈতিক একক। গ্রামের অধিপতি গ্রামণী যাঁর হাতে প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার ভার ন্যস্ত থাকত। গ্রামগুলিকে আবার এক, দশ, কুড়ি, একশ' ও হাজার—এভাবে বিভিন্ন বর্গে বিভক্ত করা হ'ত। প্রতিটি বর্গের একজন করে পরিচালক বা অধিপতি থাকতেন। কোনও স্তরে সমস্যা দেখা দিলে ঊর্ধ্বতন স্তরের অধিপতিকে ক্রমানুসারে প্রতিবিধানার্থে জানানো হ'ত। রাজাকে গ্রামবাসীর প্রত্যহ দেয় অন্ন-ইন্ধনাদি গ্রামপতিই ভোগ করতেন। ঊর্ধ্বতন অধিপতিদের জন্য নির্দিষ্ট জমির বন্দোবস্ত থাকত। সর্বত্র সর্বস্তরে পারম্পর্য রক্ষা, যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনার ছোঁয়া থাকত যার সুফল সবাই উপভোগ করত।